PRINT

সমকাল

গবেষণায় নজর চাই

উচ্চশিক্ষা

১১ ঘণ্টা আগে

ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত বিরাজমান যে সমস্যা তা দ্রুত সমাধান করা দরকার। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে এ মুহূর্তে বাস্তব, দৃশ্যত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এ জাতি। দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে কথা বলে আসছি, জানি না কতটুকু আমলে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তবে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের নতুন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি দারুণভাবে প্রত্যাশা করছি, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে নবগঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলকে (বিএসি) কর্মময় ও সক্রিয় করতে অবশ্যই দ্রুত এগিয়ে আসবেন। কারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা ও সিলেবাস কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টে এখনই হাত না দিলে ভবিষ্যতে এর দায় আমাদের নিতে হবে। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার

মান নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশে প্রশ্ন আছে। দিন দিন সার্টিফিকেট মূল্যায়নে পিছিয়ে পড়েছি আমরা। এর মূল কারণ হলো, গবেষণাহীন, সেকেলে শিক্ষা, অগভীর ও অগোছালো শিক্ষা পদ্ধতি। শৃঙ্খলা ও মানোন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যমতে, উচ্চশিক্ষা মানের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে উচ্চশিক্ষার মানের দিক দিয়ে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে ভারত। বৈশ্বিক অবস্থানে ভারত ২৯তম। বাকি দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা ৪০, পাকিস্তান ৭১ ও নেপালের অবস্থান ৭৭তম। এটি সত্যিই উদ্বেগজনক চিত্র। স্বাধীনতার এতদিন পরও উচ্চশিক্ষার তেমন গুরুত্ব বাড়েনি এ দেশে। এ খাতে চোখ দেয়নি কেউই।

ব্যানবেইসের তথ্যমতে, উচ্চশিক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লাখের সামান্য বেশি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন রয়েছে ৫৩ হাজার ২শ'টি প্রায়। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে তিন লাখ ২৭ হাজার প্রায়। এর বাইরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু আসন রয়েছে। উচ্চশিক্ষা যে হারে বিস্তৃত হয়েছে, বর্তমানে দেখা যায় ইন্টার লেভেলে ৩৬ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। তারা ১৫৫টি প্রাইভেট ও সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত প্রায় দুই হাজার বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পড়ানো হচ্ছে তাদের। অথচ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আমরা প্রায়ই দেখি, দেশে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরও বেকার হয়ে রাস্তায় চাকরির জন্য ঘুরছে। এর মূল কারণ হলো, মানহীন শিক্ষায় শিক্ষিত তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনও দেখা গেছে, ১৯৭৭ সালের জনৈক শিক্ষার্থীর হ্যান্ডনোট নীলক্ষেত থেকে ফটোকপি করে পড়ছে ২০১৯ সালের শিক্ষার্থীরা। যুগ যুগ ধরে চলছে ডিপার্টমেন্টের ওই বড় ভাইয়ের নোট। একই বিভাগের গৎবাঁধা সেই নোট তোতা পাখির মতো ঠোঁটস্থ করে যাচ্ছে। পাস করছে তারা; কিন্তু মেধাহীনভাবে। এখনও চার-পাঁচ দশক আগের সিলেবাসে চলছে বেশ কিছু ডিপার্টমেন্টে। গবেষণার ধারেকাছেও নেই এগুলো। এ হলো আমাদের উচ্চশিক্ষার একাংশের চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর অবস্থা আরও ভয়াবহ। সাত কলেজের ঝামেলা তো লেগেই আছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। দেশের প্রায় ৯০ ভাগ কলেজে এইচএসসি ও অনার্স-মাস্টার্স একই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। এটি একটি অসঙ্গত ব্যাপার এই কারণে যে, একজন শিক্ষক এইচএসসি এবং অনার্স দুই লেবেলে পড়াচ্ছেন। এটা হতে পারে না। কারণ, অনার্সে পড়ানোর সক্ষমতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা আদৌ আছে কি তার? উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার যে মানদণ্ড তাতে তা নিরূপিত হচ্ছে না। দুই লেভেলকে আলাদা করতে হবে আগে। প্রভাষক ও অধ্যাপক এই দুইকে এক করে ফেলছে আমাদের অদক্ষ সিস্টেম। শিক্ষক নিবন্ধন পদ্ধতি আরও স্পষ্ট, যৌক্তিক, আধুনিক করতে হবে। সৃষ্টিশীল প্রশ্ন দ্বারা তাদের জর্জরিত করতে হবে। এতে করে বোঝা যাবে, বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় সে কতটা চিন্তাশীল। শিক্ষকদের বেতন কাঠামো আরও উন্নত করতে হবে। যাতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হন। প্রায় শোনা যায়, উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরও কোথাও চাকরি হচ্ছে না। একসময় সে এলাকার চেয়ারম্যানের মেয়েকে বিয়ে করে তার বাপ-দাদার প্রতিষ্ঠিত স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে দেন। এভাবে শিক্ষকতা পেশার মাঝে জন্ম নিচ্ছে অনীহা, অপেশাদারিত্ব, অস্থিতিশীলতা। আমরা যদি মানসম্মত শিক্ষক দিতে না পারি, তাহলে মানসম্মত শিক্ষা কখনোই দিতে পারব না। সে জন্য বেতন কাঠামো উন্নত করতে হবে। শিক্ষক নির্বাচনে নিষ্ঠ হতে হবে, শিক্ষা ব্যয় বাড়াতে হবে, নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠু হতে হবে। আশার কথা হলো, এবার নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ ব্যয় করবে বলে অঙ্গীকার করেছে। অতীতে ইউনেস্কোর সুপারিশ ছিল

এ খাতে ৪ শতাংশ ব্যয়ের। বর্তমানে শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে মাত্র ২ শতাংশ।

মানের বিচারে, রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের অন্যান্য এলাকার চিত্র পুরো অমিল। ঢাকার বাইরের অনেক কলেজে দুই-চারজন শিক্ষক দিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে মাস্টার্স ডিগ্রি। এত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে এত বড় কোর্স চালালে মানোন্নয়ন হবে কী করে? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, উপযুক্ত শিক্ষক বা গবেষণা এগুলো অনেক পরের বিষয়। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে আরও একটি বড় বাধা শিক্ষক নিয়োগের স্পষ্টতা নিয়ে। প্রথমে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটির দিকে নজর দিতে হবে। অস্বচ্ছ, অযোগ্য, সুপারিশ, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় চাপে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের। অনেক জায়গায় অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ হয়, এমনটাও শুনেছি। উন্নত বিশ্বের কোথাও এমনটি হয় বলে আমার জানা নেই। আরও অবাক করার বিষয় হচ্ছে, মাত্র ৫-১০ মিনিট একটা ভাইভা নিয়েই নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষকদের। সময় পাল্টে গেছে; তাই এখন অনেক কিছু খতিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীর একাডেমিক পুরো রেকর্ড, রি-কমান্ডেশন, ক্লাসরুম পারফরম্যান্স দেখতে হবে এবং তার গবেষণাপত্রগুলো মানসম্মত কিনা তা দেখতে হবে। এসব বিষয় দেখে সুস্পষ্ট, বিধিবদ্ধ নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া উচিত। শুধু শিক্ষক নিয়োগ নয়, তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও স্পষ্টতা থাকা খুব জরুরি। তেল মর্দন বা দলীয় গুরুত্বকে না দেখে তার গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মান ও আদর্শিকভাবে গণ্য কি-না খতিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রত্যেক ধাপে 'ওয়ব অব সায়ান্স', 'স্কোপাস'-এ ইনডেস্ক করা আছে, এমন জার্নালে অন্তত একটি করে প্রকাশিত আর্টিকেল থাকা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

অনেকেই ভাইভা বোর্ডে অসংখ্য গবেষণা দেখিয়ে পদোন্নতি পান; কিন্তু একটু সময় নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তা কতটুকু মানসম্পন্ন। যেসব জার্নালের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জিরো, কেউ পড়ে না, সাইটেশন নেই, এইচ ফ্যাক্টর বা এন ফ্যাক্টর ঠিক নেই, সেসব বিষয়ের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। ইন্টারনেটে সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে জার্নাল কতখানি অ্যাভেইল্যাবল তা দেখতে হবে। অনেক জার্নাল প্ল্যাজারিজম চেক করে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে প্ল্যাজারিজম চেক বাধ্যতামূলক করা দরকার। কেউ মিশেল ফুকোর লেখা কপি করলে সেটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেইল দিয়ে জানাতে হবে কেন? এটা মানসম্মত জার্নালে তো প্রকাশই হওয়ার কথা না। এগুলো সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সদ্য গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলকে সক্রিয় করার বিকল্প নেই। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষাবিষয়ক কাউন্সিল থাকলেও বাংলাদেশে এখনও অধরাই এ পরিকল্পনা।

শুধু মাস্টার্স পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন এমন নজির বিশ্বে বিরল। এমফিল, পিএইচডি ও গবেষণায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় বা পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তা উন্নত বিশ্বে অচল। আশির দশকের বিধি-নিয়মের মধ্যে এখনও নিয়োগ দেওয়া হয়। যার কারণে মেধা যাচাই, সক্ষমতা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণায় দক্ষতা বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মানেই গভীরতা, গবেষণা ও জ্ঞানের আধার। গুণগত, উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য উল্লিখিত পন্থাগুলোকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

এগুলোর পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবকাঠামো সুবিধা, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, সিলেবাস, ফ্রেমওয়ার্ক দেখতে হবে। বছর শেষে শিক্ষককে মূল্যায়নের সংস্কৃতি চালু করতে হবে। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংস্কৃতি চালু থাকলেও তা সার্বজনীন নয়। আন্তর্জাতিক মানের প্রোগ্রামকে লক্ষ্য রেখে পড়াতে হবে।

একজন শিক্ষার্থী এসব বিষয় কেন পড়বে, কী অর্জন করবে, বিষয়ভিত্তিক কী পরিবর্তন আসবে ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মানহীন উচ্চশিক্ষা নামের পাগলা ঘোড়ার লাগাম এখনই টেনে না ধরলে এর নেতিবাচক প্রভাব গ্রাস করে ফেলবে আগামী প্রজন্মকে। পরবর্তীকালে এ খাতে যতই বাজেট বাড়ানো হোক না কেন, কোনো কাজেই তা আসবে না। তাই এখনই সময় উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়ার।

শিক্ষাবিদ, গবেষক

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com